সরেজমিনে নারায়ণগঞ্জের হরিজন পল্লী

দীপংকর গৌতম

বাংলাদেশে এই দলিত নিম্নবর্গের মানুষেরা শুধু যে অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার মধ্যে বাস করেন তাই নয়, তার ওপর তাঁদের প্রতিনিয়ত অবহেলা, অপমান, লাঞ্ছনা, সামাজিক দলন ও বিদ্বেষের মধ্যে থাকতে হয়। সমাজ চিন্তা ও রাজনীতির মধ্যে তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না। এই অবস্থার পরিবর্তন হতে হবে। বর্তমান লেখা এ বিষয়ে সর্বজনকথার ধারাবাহিক অনুসন্ধানের অংশ।

হিন্দু বা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জাতিভেদপ্রথাটির বিষবৃক্ষ রোপন করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলো আর্যরা। তারপর বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী জাত-পাতের বিভাজন করেই গেছেন। জাত-পাতের বিভাজন সামাজিকভাবে এমন নির্যাতনে রূপ নিয়েছিলো যে সমাজে নিম্ন বর্গের মানুষের টেকাই দায় হয়ে উঠেছিলো। ভারতবর্ষে এই বিভাজনের মধ্য দিয়ে বিস্তৃতি ঘটে বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের। কিন্তু জাত-পাতের সংকট ভারত-বাংলাদেশ থেকে আজও যায়নি। বাংলাদেশের দলিত হরিজনরা এখনো মূল স্রোতের সঙ্গে মিশতে পারেনি। ফলে তারা কলোনী ভিত্তিক জীবন যাপন করে যাচ্ছে ব্যাপক অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশে দুই ধরনের দলিত জনগোষ্ঠি রয়েছে- বাঙালি দলিত ও অবাঙালি দলিত। বাংলাদেশে বসবাসরত দলিতদের সংখ্যা বর্তমানে ৩৫ লক্ষ। বাঙালি দলিত বলতে চর্মকার, মালাকার, কামার, কুমার, জেলে, পাটনী, কায়পুত্র, কৈবর্ত, কলু, কোল, কাহার, ক্ষৌরকার, নিকারী, পাত্র, বাউলিয়া, ভগবানীয়া, মানতা, মালো, মৌয়াল, মাহাতো, রজদাস, রাজবংশী, রানা কর্মকার, রায়, শব্দকর, শবর, সন্ন্যাসী, কর্তাভজা, হাজরা প্রভৃতি সম্প্রদায় সমাজে অস্পৃশ্যতার শিকার। এই সব সম্প্রদায় আবার বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। ইসলাম ধর্ম জাতিভেদকে অস্বীকার করলেও এই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেকে পেশার কারণে সমাজে পদদলিত হয়ে রয়েছে, যেমনঃ জোলা, হাজাম, বেদে, বাওয়ালী। অবাঙালি দলিত বলতে আমরা বুঝি ব্রিটিশ শাসনামলের মাঝামাঝি (১৮৩৮-১৮৫০) বিভিন্ন সময়ে পূর্ববঙ্গে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মী, চা-বাগানের শ্রমিক (১৮৫৩-৫৪), জঙ্গল কাটা, পয়ঃনিষ্কাশন প্রভৃতি কাজের জন্য ভারতের উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, উড়িষ্যা, কুচবিহার, রাচি, মাদ্রাজ ও আসাম থেকে হিন্দি, উড়িষ্যা, দেশওয়ালী ও তেলেগু ভাষাভাষী মানুষের পূর্ব-পুরুষদের নিয়ে এসেছিল। অভাবী এই অভিবাসীরা দেশের সর্বত্র পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং সিলেটে চা-শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। ভূমিহীন ও নিজস্ব বসতভিটাহীন এসকল সম্প্রদায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জমি, রেলস্টেশনসহ সরকারি খাস জমিতে বসবাস করছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ হেলা, মুচি, ডোম, বাল্মিকী, রবিদাস, ডোমার, ডালু, মালা, মাদিগা, চাকালি, সাচ্চারি, কাপুলু, নায়েক, নুনিয়া, পরাধন, পাহান, বাউরি, বীন, বোনাজ, বাঁশফোর, ভূঁইয়া, ভূমিজ, লালবেগী, জনগোষ্ঠী। এসব জনগোষ্ঠী তেলেগু, ভোজপুরী, জোবালপুরী, হিন্দি, সাচ্চারী ও দেশওয়ালী ভাষায় কথা বলে। বাংলাদেশের দলিত ও হরিজনরা কেমন আছে তা বোঝার জন্য জন্য সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের হরিজনপল্লী ঘুরে আসার অভিজ্ঞতা লিখছি।

নারায়নগঞ্জ শহরের চাষাঢ়া থেকে রিক্সায় টানবাজার থামতেই হরিজন পল্লীর অবস্থান। ঢুকতেই মনে হবে দেশের প্রচলিত কোন এলাকা থেকে ভিন্ন এলাকায় ঢুকছি। চিপা গলি, আধো আলো আধো অন্ধকার, জলে ভেজা স্যাঁতসেতে ছোট ছোট খুপরি ঘর, উন্মুক্ত ড্রেন থেকে ভেসে আসছে ময়লার দুর্গন্ধ। তার মধ্যেই খেলছে হরিজন পল্লীর শিশু কিশোররা। এমনই এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেড়ে উঠছে তারা। এরা পেশায় সুইপার- পৌরসভা গার্মেন্টস ও হাসপাতালে চাকরি করে। এদের বেতন শুনলে অবাক হতে হয়- ঝাড়ুদার ৩ হাজার টাকা, হাতল গাড়ি ৪ হাজার, ড্রেনম্যান ৩ হাজার আর সিটি কর্পোরেশনের ট্রাকে থাকলে ৬ হাজার টাকা। পুজায় বোনাস নেই। কালিপুজা ও দুর্গাপুজায় এ্যাডভান্স ২ হাজার টাকা দেয়। তাও মাসে মাসে কাটে ২০০ করে। মারা গেলে ৫ হাজার টাকা। বোনাস স্কেল, কিছু নাই।

> দিনের পর দিন ড্রেন বদ্ধ থাকে, জল পড়লেই উপচে উঠে। বর্ষাকালে অবস্থা আরও ভয়ংকর রূপ নেয়। ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিজ যেন এখানে বাসা বেধেছে। অপুষ্টি এখানকার একটি বড় সমস্যা।

"আমরাতো ভোট দেই। আমাদের ভোটে প্রার্থী নির্বাচিত হয়। তারপরে আর আমাদের খোঁজ খবর রাখেনা কেউ। আমাদের এই হরিজন পল্লীতে ১৮০ টি খুপরি ঘর। তাতে ২২০ পরিবারের ১০০০ লোক বসত করে। বিবাহিত ছেলে-মেয়ে, বাবা-মা সব এক ঘরেই থাকতে হয়। ওই একটা খুপড়ি ঘরে কয়েকটা পরিবার কি অমানবিকভাবে বসত করে তা বলে শেষ করা যাবেনা। যাবে কোথায়? এ চাকরিটাও রাখতে হয়। নইলে থাকবে কোথায়?"- হরিজন পল্লীর মাতবর বলরাম দাস এক নিশ্বাসে একথাগুলো বলেন।

এর মধ্যে এক বাচ্চা এসে বলে গেল কলে পানি এসেছে। অমনি ছোটাছুটি বালতি গামলা নিয়ে। জল ভরে স্টোর করতে সবাই ব্যস্ত। জল নিয়ে ছোটাছুটিতে পুরো পল্লীর গলি গুলো ভিজে গেল। এ জল আর শুকাবেনা। ফলে জায়গাটা স্যাঁতসেতে হয়ে যায়। কথা হয় স্নাতক পরীক্ষার্থী মিনা রানী দাসের সঙ্গে। তিনি জানান- এ কলোনী এখন বসবাসের পুরোপুরি অনুপযোগী। এতটুকু ঘরের মধ্যে আলো-বাতাস কিছু যায়না। তারপর স্যাঁতসেতে পরিবেশ।

খোলা ড্রেন কলোনীর ভেতর দিয়ে চলে গেছে। দুর্গন্ধে টেকা দায়। কমিশনারের কাছে গিয়ে কোন ফল হয়নি। দিনের পর দিন ড্রেন বন্ধ থাকে, জল পড়লেই উপচে উঠে। বর্ষাকালে অবস্থা আরও ভয়ংকর রূপ নেয়। ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিজ যেন এখানে বাসা বেধেছে। অপুষ্টি এখানকার একটি বড় সমস্যা। অপুষ্টির কারণে গায়ে গতরে বাড়েনি এরকম বহু ছেলে মেয়ে আছে। এদের পিতা যে টাকা বেতন পায় তাতে সন্তানকে পুষ্টিজাত খাদ্য খাওয়াবে কিভাবে? এই কলোনীতে রিউমেটিক ফিভারের প্রকোপ অনেক বেশী। একটা ছেলে বা মেয়ে একটু বড় হলেই বলে- গিটে ব্যথা করে। ডাক্তারের কাছে নিলে বলে রিউমেটিক ফিভার। এ কলোনীতে রিউমেটিক ফিভার বেশি কেন? তা জানতে কথা বলেছিলাম প্রিভেন্টিভ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. লেলিন চৌধুরির সাথে। তিনি বললেন- ঘিঞ্জি স্যাতঁসেতে পরিবেশ যেখানে সূর্যের আলো ঠিকভাবে পৌঁছায় না, সেখানে রিউমেটিক ফিভার হবেই।

এছাড়াও মানুষ এখনো এমন রয়ে গেছে যে, একটু বয়স্ক লোকেরা চা খেতে গেলে তাদের ঘর থেকে গ্লাস নিয়ে যেতে হয়। যদিও এসব আচরণ আগের চেয়ে কমেছে তারপরও সহসা কি এসব দূর হয়? এখানে এক সময় শিক্ষার আলো জ্বলতো না। এখন অনেক ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। লেখাপড়ার দিকে মেয়েরা এগিয়ে। বেশিরভাগ অভাবী পরিবার। ছেলেরা সাথে কাজ করলে রোজগারটা একটু বেশি হয়। তাই ছেলেরা বেশিরভাগই কাজে চলে যায়। মেয়েরা পড়াশুনা করে। পড়াশুনার জন্য আছে দুটি স্কুল- একটা শারি'সংস্থা পরিচালিত শারি বিকাশ ফ্রি প্রাইমারী স্কুল অন্যটা সরকারী। নাম ৩৩ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই কলোনীর এখন ৪০-৫০ জন ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করে। এরা প্রাথমিক বিদ্যালয় পার করে হাই স্কুলে যায়। স্কুল বা কলেজগামী মেয়েদের দেখলে এখনও'মেথর যায়', 'মেথর যায়'- বলে টিজ করে বয়স্ক লোকজনও। এখানের এই খুপড়িতে বসে আলো জেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এমন ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা কম নয়। এরা চাকরিতে ইন্টারভিউ দিলে চাকরি হয়ে যাওয়ার অবস্থায় যখন তার ঠিকানা 'সুইপার পল্লী' দেখে তখন তাদের কাজটি আর হয়না। এই বৈষম্যের কারণে শিক্ষিতদের হতাশ হওয়া ছাড়া পথ থাকে না।

হরিজন পল্লীর বিজলী দাস জানান, তাদের এখানে অনেক অনিয়ম ছিলো যেগুলো পঞ্চায়েতরাও মেটাতে পারতো না। পঞ্চায়েত মানে ৫জনের একটা কমিটি। এ কমিটি পল্লীর ভেতরকার সালিশী, মীমাংসা বিচার আচার করে। পাঁচজনের কমিটি বলেই এর নাম পঞ্চায়েত। তবে এরা কোন কাজ করলে তরুণ,বুদ্ধিমান ব্যক্তিদেরও ডেকে নেয়। একটা সময় ছিল যখন এসব পঞ্চায়েতদের সামনে দিয়ে কেউ হাঁটতো না। নারীরাতো সামনেই আসতো না। কোন নারী একটু অসতর্কভাবে এদের সামনে দিয়ে হাঁটলে পঞ্চায়েতরা সেসব পরিবারের পুরুষদের ডেকে শাসিয়ে দিতো। নারীরা ঘরের বাইরে যেতে পারতো না। পঞ্চায়েতরা বিচারে বসে কখনো নারীদের কথা শুনতে হলে ২ সদস্যের একটা ঝুরি কমিটি ছিলো। ঝুরি কমিটির সবই ছিলো পুরুষ ফলে নারীর কথা শুনতে কেউ আসতো না। এক সময় নারীদের সেখানে এক অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতো। এখন অনেক নারী ভোর বেলা গিয়ে কাজ করে ৬ টার মধ্যেই ঘরে ঢোকে। কাজের বেতন স্বামী'র হাতে তুলে দিতে হয়। হরিজন পল্লীর আরেক নারী রীনা দাস জানান, এখানকার পুরুষদের মনোভাব বদলানোর জন্য এনজিওর একটা ভূমিকা রয়েছে। এনজিওরা প্রথমে নারীদের পঞ্চায়েত কমিটির মধ্যে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রথমে নারীরা পঞ্চায়েত কমিটিতে আসতে চাইতো না। পরে নারীদের সংগঠিত করে চালু করা হয় ছায়া পঞ্চায়েত। ধীরে ধীরে নারী-পুরুষ পঞ্চায়েতদের সমন্বয় হয়েছে। নারী নির্যাতন কমেছে।

হরিজনরা খুবই উৎসব প্রবণ একটি সম্প্রদায়। এদের বারো মাসে তের পার্বনতো আছেই। তাছাড়াও দোল উৎসব, কালীপুজা, দুর্গা পুজা, হুলকা পুজা, সূর্য পুজায় এরা খুবই আনন্দ করে। সাংস্কৃতিকভাবে এরা বেশ সমৃদ্ধ কিন্তু মূল স্রোতের সঙ্গে নেই বলে এদের উৎসব বা এদের মধ্যে যে মান সম্পন্ন কণ্ঠশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পী রয়েছে সে কথা জানেনা কেউ। এই শিল্পীরা জাতীয়ভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেলে দেশের সংস্কৃতির জন্যও হতো সুসংবাদ। তবে এরা যে পরিবেশে থাকে সেখানে বসে অন্যকিছু চিন্তা করা কষ্টকর। তাই নারায়নগঞ্জের হরিজনদের দাবি কলোনীটা ভেঙে বহুতল ভবন নির্মাণ করে তাদের আবাসন সংকটের সমাধান করা হোক। আবাসন সংকটে তারা আর কতকাল ভুগবে, কতকাল অপুষ্টি-অজীর্ন নিয়ে বেড়ে উঠবে তাদের শিশুরা!

সাংস্কৃতিকভাবে এরা বেশ সমৃদ্ধ কিন্তু মূল স্রোতের সঙ্গে নেই বলে এদের উৎসব বা এদের মধ্যে যে মানসম্পন্ন কণ্ঠশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পী রয়েছে সে কথা জানেনা কেউ।

হরিজন পল্লী বাংলাদেশের বাইরে নয় কিন্তু এ পল্লীতে ঢুকলে মনে হয়না এটা বাংলাদেশের কোন এলাকা, মনে হয় কোন ভিন গ্রহে আছি। রাষ্ট্রীয় অধিকারের সামান্যও তারা পায় না। অথচ এরা সবাই ভোটার, নির্বাচনে ভোট দেন। প্রার্থীরা আসে, মাথায় হাত বুলায়, সমস্যা-সংকট নিরসনের আশ্বাস দেয় অথচ নির্বাচন শেষ হলে হরিজনদের আর চেনেনা। হরিজনদের বেতন-কাঠামো বদল করা থেকে আবাসনে পরিবর্তন আনলে ১৬ লক্ষ হরিজনের এই দুর্দশার অবসান ঘটে। এদের নিয়ে কাজ করে একাধিক এনজিও। এসব এনজিও অনেক টাকা ফান্ড আনে এদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য। মাঝে মধ্যে মিটিং-মানববন্ধন ইত্যাদি করে, হরিজনদের বিরানীর প্যাকেট কিনে দেয়, শিক্ষায় তাদের কোটার জন্য আন্দোলন করে। কিন্তু স্বভাবতই প্রশ্ন আসে শুধু কোটা নিয়ে আন্দোলন কেন? তারা এ দেশের নাগরিক। নাগরিক হিসেবে প্রাপ্য তাদের সকল অধিকার, মানুষ হিসেবে তাঁদের পূর্ণ মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সমাজচিন্তার বিস্তার ঘটাতে হবে, সেই রাজনীতি দাঁড়াতে হবে শক্তভাবে।

দীপংকর গৌতম: লেখক, সাংবাদিক ও গবেষক ।
ইমেইল: dipongker@yahoo.com